সত্যজিৎ রায়: জন্মশতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি সভ্যতার সংকট ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

মাহমুদুল হোসেন



(21621

(と)(ら)

বাড়ি ৬৬, সড়ক ৯এ, ফ্লাট ৪বি, ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯, বাংলাদেশ dak@noktaarts.com, noktaarts.com © +৮৮০ ১৮১৯ ২৭৬৪৫৮, +৮৮০ ১৮৪৭ ২২৭৭৭৭

(a) +000 3038 2108(0, +000 3081 22111

প্রথম নোকতা প্রকাশ: পৌষ ১৪২৮, ডিসেম্বর ২০২১

গ্রন্থস্থত

টেক্সট © মাহমুদূল হোসেন বই © নোকতা

ISBN 978-984-94920-4-7

পরিবেশক
ব্বুক
পশ্চিমবঙ্গ পরিবেশক

বইপন্তর

এই প্রস্থে ব্যবহাত সকল ইমেজের ব্যবহারের অনুমতি নিয়মতান্ত্রিকভাবে নেয়া সম্ভব হয়নি। যদি ব্যবহাত কোনো ইমেজের স্বত্যধিকারী আপত্তি উত্থাপন করেন তবে পরবর্তী মুদ্রণ বা সংস্করণে সেই ইমেজ বাদ দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, এই গ্রন্থটি নির্মাণ, উৎপাদন সম্পূর্ণভাবে বাণিজ্যিক নয়। বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় এটি আমাদের ছোট প্রচেষ্টা।

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লিখ্যিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

shobbhotar shongkot o onyanyo proshongo by mahmudul hossain, published by nokta, december 2021, dhaka, bangladesh.

পাঠকের মূল্য ৮৪৮৫ • ₹৪৮৫

মুদ্রণ পরিষেবায় রেপ্লিকা, replikagrapiks.com, mail@replikagrapiks.com

*প্রচ্ছদ ও শব্দবিন্যাস নোকতা শিল্প বিভাগ

* "সত্যজিৎ রায় ইন ওয়ান হাড্রেড অ্যানেকডোটস" বইয়ের ইলাস্ট্রেশন হতে অনপ্রাণিত



ভূমিকা . ০৯

অপু ত্রয়ী: আন্তঃব্যক্তিকতা ও বিচ্ছিন্নতার বর্ণনা . ১৫

চারুলতা: একটি আধুনিক শিল্পসৃষ্টি . ৬৩

কাঞ্চনজঙ্ঘা . ৯১

মহানগর চতুষ্টয়: এইসব নাগরিক-মানুষ . ১০৭

সত্যজিতের ছোট ছবি . ১৭৫

শেষ ত্রয়ী ও সভ্যতার সংকট . ১৯৫

সত্যজিতের সৌমিত্র . ২৫১

প্রসঙ্গ সত্যজিৎ: চিত্রময় ইতিহাস অবলোকন . ২৬৩

রায় পুনর্বিবেচনা: একটি লিখন মাত্র . ২৭৫

hochock

সূচিপত্ৰ

এ বছর, ২০২১ সালে, সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবর্ষ পালিত হচ্ছে। মহামারির কারণে এই উদ্যাপন অনেকখানি সীমাবদ্ধ। অনেক অনুষ্ঠান অন্তর্জালে আয়োজিত হচ্ছে। অনেকে বছরটি পালনের যে ধরনের আয়োজন করতে চেয়েছিলেন সেরকম অন্তর্জালে সম্ভব না হওয়ায় আয়াজনটিই স্থণিত করেছেন। এ উপলক্ষে যত প্রকাশনা হবে বলে আশা করেছিলাম, তত প্রকাশনাও হচ্ছে না। সব মিলিয়ে যে কঠিন সময় পার করছি সকলে তার ছাপ পড়েছে এই মহান চলচ্চিত্রকারের জন্মশতবর্ষ উদযাপনে।

আমার এ বছর সত্যজিৎ রায়ের কাজ নিয়ে কোনো বই প্রকাশের পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু ধরে নিয়েছিলাম এ বছর অনেক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হবে। হয়তো কোনো কর্মশালা বা সেমিনারে কথা বলতে হবে। এভাবে এই মহান শিল্পীকে নিয়ে করা কাজের ভাণ্ডারটি বিস্তৃততর হবে। পরে সব কাজ নিয়ে একটি বই প্রকাশের কথা ভাবা যাবে নিশ্চয়ই। দেখা যাচ্ছে যে সেরকম এখনও ঘটে নি এবং এ বছরের মধ্যে ঘটার সম্ভাবনাও কম। মে মাসেই, তাঁর জন্মমাসে, একটি অন-লাইন অনুষ্ঠানে কথা বলার পর বই প্রকাশের বিষয়টি মাথায় আসে। মনে হয়, এই বিশেষ বছরটিতে নিজের অংশগ্রহণ এত সীমিত হলে চলছে না!

খোঁজ নিয়ে দেখলাম হাতে রয়েছে অন্তত সাতটি লেখা। এর ভেতর একটি একেবারেই তথ্য প্রদানের মতো ব্যাপার। বাকি ছটি লেখাকে নতুন করে প্রকাশের কথা ভাবা যেতেই পারে। স্থির করা গেল যে তিনটি নতুন লেখা লিখব। বড় আকারে। অপু ত্রয়ী, কলকাতা চতুষ্টয় এবং শেষ ত্রয়ী নিয়ে। এভাবে মোট নয়টি লেখা নিয়ে হবে নতুন একটি বই; সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবর্ষে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন।

এই বইতে এমন লেখা রয়েছে যা আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে লেখা। সেসব লেখার সব কথা এবং যুক্তি আজ কোনো দ্বিধা ছাড়া মেনে নিতে পারব, এমন নয়। কিন্তু লেখাগুলো এখনকার মত ও মনন অনুসারে পরিবর্তন করা থেকে বিরত থেকেছি। বরং ভেবেছি, সত্যজিৎ রায়ের কাজ নিয়ে আমার দীর্ঘকাল ধরে যে ভাবনা এবং তার বিবর্তন, সেই ছাপটি থাকুক এই বইতে। সুতরাং, পুরনো লেখায় সেভাবে হাত দেওয়া হয় নি। বানান সমতাকরণ, তথ্য সংশোধন বা সমসাময়িকীকরণ এবং ছোটখাটো বাক্যের গঠনে পরিবর্তন আনা ছাড়া আর কোনো সম্পাদনা আমার দিক থেকে করা হয় নি। এভাবে যে লেখার ভাগুরে উপস্থিত করা গেল তাতে সম্ভবত সত্যজিৎ রায়ের কাজ নিয়ে আমার চিন্তার বিবর্তনটি যেমন ধরা পড়বে, তেমনি আমার সামগ্রিক চলচ্চিত্র চিন্তার পরিবর্তনের চিহ্নগুলোও মনোযোগী পাঠক আবিষ্কার করতে পারবেন।

প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলো তাদের রচনার কাল অনুযায়ী সাজানো হয় নি। ছবিগুলোর সময় এবং রচনার মেজাজ—এ দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে এই বইতে তাদের উপস্থাপন করেছি। দীর্ঘ সময় ধরে লিখিত রচনাগুলো কোনো নির্দিষ্ট টীকা নির্দেশের নিয়ম মেনে চলা হয় নি। এখন সংকলন করতে গিয়ে দেখলাম সে কাজটি সহজসাধ্য নয়। তাই মূল লেখাগুলোতে টীকা এবং সূত্র নির্দেশ যেভাবে আছে এখানে সেভাবেই থাকল। এতে বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে এই বইয়ের মান কিছুটা অবনত হলো, সে কথা মেনেই নিচ্ছি।

যে লেখাগুলো এখানে রইল তারা সত্যজিৎ রায়ের শিল্পভাবনার খুব মৌলিক কোনো পাঠ—এমন দাবি করব না। কিন্তু চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়কে বোঝার জন্যে লেখাগুলো হয়তো এক ধরনের রেফারেন্স হিসেবে খুব খারাপ কিছু হবে না। অন্তত নানা দিক থেকে তাঁর কাজের ঐশ্বর্যের ওপর আলো ফেলে দেখার চেষ্টাটি করা গেছে।

আন্তঃব্যক্তিকতা ও বিচ্ছিন্নত

অপু ত্রয়ী

আন্তঃব্যক্তিকতা ও বিচ্ছিন্নতার বর্ণনা

আন্তঃব্যক্তিকতা (intersubjectivity) ও বিচ্ছিন্নতা (alienation) সমাজবিজ্ঞানে বিপরীত ধারণা হিসেবে উপস্থাপিত হয় না। কিন্তু একথা মানতে হয় যে তাদের সন্তাতাত্ত্বিক অবস্থানের মধ্যে বিপ্রতীপতা আছে।

আন্তঃব্যক্তিকতা মূলত সামাজিকতা শব্দেরই বিদ্যায়তনিক প্রতিরূপ। সমাজের সদস্যরা যেভাবে নিজেদের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে, যেসব সংকেত এবং পারস্পরিক বোধগম্য আচরণের ভেতর দিয়ে সামাজিক অভিব্যক্তি নির্মাণ করে তাকেই আন্তঃব্যক্তিকতা বলা যায়। আর আন্তঃব্যক্তিকতার ভেতর দিয়েই সমাজের সদস্যদের ব্যক্তিক বিকাশ ঘটে; আত্মিক এবং মেধাগত। আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী জর্জ হার্বার্ড মিড আন্তঃব্যক্তিকতা প্রসঙ্গে বলেছেন, "development of cognitive, moral, and emotional capacities in human individuals is only possible to the extent that they take part in symbolically mediated interactions with other persons. ... ontogenesis is essentially and irreducibly intersubjective. ... intersubjectivity—understood specifically in terms of

linguistically mediated, reflexively grasped social action—

সভ্তোর সংকট ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

furnishes the key to understanding mind, self, and society." 5

বিচ্ছিন্নতার ধারণাটি প্রথমে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কার্ল মার্কস। সে ধারণাটি পুরোপুরি ছিল অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতাবিষয়ক। তিনি দেখিয়েছিলেন যে, মানুষ কীভাবে পুঁজিবাদী সমাজে নিঃসঙ্গতা, অমানবিকতা ও স্বপ্নভঙ্গ হওয়াকে অভিজ্ঞান করে। তিনি জোর দিয়েছিলেন এই বিষয়টির ওপর যে, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই এই অবস্থার নিয়ামক। অন্যদিকে, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা আরো ব্যাপকভিত্তিক একটি ধারণা। সমাজ বিজ্ঞানীরা বলতে চান যে, ব্যক্তি বা একটি জনগোষ্ঠী যে সমাজে তারা বাস করে তার মূল্যবোধ, সামাজিক রীতি, প্রথা এবং সামাজিক সম্পর্কগুলো থেকে নানা কারণে বিচ্ছিন্ন বোধ করতে পারে। সমাজবিজ্ঞানী মেলভিন সিম্যান অন দ্য মিনিং অব অ্যালিয়েনেশন প্রবন্ধে সামাজিক বিচ্ছিন্নতার চারটি লক্ষণ শনাক্ত করেছিলেন। এগুলো হলো ক্ষমতাহীনতা, অর্থহীনতা, সামাজিক নিংসঙ্গতা এবং আত্মবিচ্ছিন্নতা। সামাজিক বিচ্ছিন্নতার কারণ হিসেবে স্থানচ্যুতি, সংখ্যালঘুত্ব, সামাজিক শ্রেণবিন্যাসের নিচের দিকে অবস্থান করা, অশিক্ষা—এসব নানা বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ওপরের আলোচনা সম্ভবত এই বিষয়টি দেখায় যে আন্তঃব্যক্তিকতা সামাজিক বন্ধন এবং সামাজিক-ব্যক্তিকতাকে নির্মাণ করে। অন্যদিকে, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ব্যক্তিকে বা জনগোষ্ঠীকে বিচ্ছিন্ন করে বৃহত্তর সমাজ থেকে।

যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন এই উপমহাদেশের মধ্যযুগীয় সনাতন কৃষিভিত্তিক সমাজের গোড়া নাড়িয়ে দিয়েছিল। পর্যায়ক্রমে ইউরোপীয় বণিক পুঁজির আবির্ভাব, কৃষি-ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন, সারা উপমহাদেশ জুড়ে রেললাইন স্থাপন, সম্পদের ব্যাপক লুষ্ঠন এবং ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার এদেশের সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহতে এবং মানুষের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। দেশজুড়ে নগর স্থাপিত হয়েছিল। সেখানে অনুপস্থিত জমিদার ও ইংরেজি শিক্ষার ফললাভকারী নানা নতুন পেশার লোক সমাগত হয়েছিল। ক্রমশ তার ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিছু মানুষ ইউরোপীয় বিশ্ববীক্ষার সাথে এক ধরনের পরিচিতি অর্জন করেছিল। তারা বিজ্ঞান ও মানববিদ্যার তত্ত্বসমূহ পাঠ করেছিল এবং বাণিজ্যের নতুন কলাকৌশল শিখেছিল। এক সময় কারখানা স্থাপিত হয়েছিল এবং সেখানে



পথের পাঁচালী

শৈশবে দুর্গা ও পিসি (ইন্দির ঠাকুরণ) ফিমা ঞ্কিনশট: ০৭:৫৮

boobook



কৈশোর উত্তীণ দুর্গা ও পিসি (ইন্দির ঠাকুরণ) ফিম ফ্রিনশট ২৮:১৫ মারা যান। আর দুর্গাকেও মরে যেতে হয় তাড়াতাড়িই; ত্রয়ীর প্রথম পর্বের মধ্যেই। কারণ, এই প্রকল্পে, আধুনিকতার যে প্রকল্পের কথা বলছি বারবার, সেখানে এইসব গ্রাম্য, প্রায় অশিক্ষিত, পরনির্ভর নারীর স্থান নেই! অপুকে নিয়ে যে বৃহত্তর পরিকল্পনা—সে নগরে যাবে, বিজ্ঞান পড়বে, নগরের জীবন সংগ্রামে নিরত হবে, নাগরিক বিচ্ছিন্নতাকে অভিজ্ঞান করবে—সেখানে এইসব নারীর জন্যে স্পেস নির্মাণ প্রায় অসম্ভব। তাই তারা বিদায় নেয় ক্রুতই। আর জীবনে ইন্দির আর দুর্গা যে নিকটবর্তী, প্রায় সমব্যথায় ব্যথী সে তো এই অনিবার্য ভবিষ্যতেরই ইঙ্গিতবাহী; সঙ্গীতের প্রকরণে মূল মেলোডির সাথে চলতে থাকা মাইনর হারমনি। এভাবেই দুর্গা ও পিসির অধ্যায় নির্মিত তবে; এই তার পাঠ।

অপু ও দুর্গা

অনেক পরে, অপুর সংসার ছবিতে, ফুলশয্যার রাতে অপু অপর্ণাকে বলে, "একটি বোন ছিল... দিদি।" অপু বাবা-মায়ের মৃত্যুর কথাও বলে তার আগে। সে বলায় কোনো বিশেষত্ব আমাদের কানে বাজে না। কিন্তু দিদির মৃত্যু নিয়ে এই ছোট বাকাটি এবং তার মাঝে একটু থেমে পড়া আমাদের ভেতরে রেখে যায় গভীর কোনো দাগ। অথবা, আমরা তাৎক্ষণিক প্রমণ করে আসি কাশবন, তেপান্তরের মাঠ, পুকুর পাড়ে বৃষ্টির অঝোর ধারা, মিষ্টিওলার পেছনে পেছনে ছোটা, চুরি করা আচারের স্বাদ, দাওয়ায় বসে সন্ধ্যার রূপকথা—এইসব অমিয় স্মৃতি। অপু এয়ী-তে যেসব আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক নির্মিত হয়েছে তার মধ্যে অপু-দুর্গার সম্পর্ক দৃশ্যগত অভিঘাত সৃষ্টিতে অপ্রতিহন্দ্বী এবং এভাবে আমাদের অবচেতনে সে যে বোধ সঞ্চিত করে তা হয় গভীর ও দীর্ঘমেয়াদী। অপুর যে সংবেদী মনটির পরিচয় আমরা পাই পরে, যখন সে সাহিত্যিক ওপ্রেমিক, তার ভিতটি গড়ে উঠেছিল নিশ্চিন্পপুরের সেই নিস্তরঙ্গতায় দিদির সাথে জীবনের সামান্যতার উদ্যাপনে—এই ব্যক্তিনিষ্ঠ অনুভব আমাদের মধ্যে 'সদা সঞ্চরমান' হয়!

অথচ দুর্গার মৃত্যুও অনিবার্য ছিল! রেলগাড়ি দেখতে চায় অপু এবং তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে একদিন যখন সত্যি সত্যি রেল ইঞ্জিনের 'কু ঝিক ঝিক' শুনতে পায় তারা, দুর্গাই প্রথম শোনে এবং বুঝতে পারে যে এটা স্মৃতিও। অপু কি আর কখনও ফেরে নিশ্চিন্পপুরে? আমরা জানি না, কিন্তু অপু ত্রয়ীর যে মেজাজ এবং গতি তাতে মনে হয় নিশ্চিন্পপুরের নিশ্চিত নিস্তরঙ্গতা চিরকালের জন্যে হারিয়ে যায় অপুর জীবন থেকে। অবশ্য অনেক পরে, অপুর সংসার-এ, শ্বশুর মশায়কে অপু বলে যে কাজলের জন্যে নিশ্চিন্পপুরে সে একটা ব্যবস্থা করেছে। এতে করে মনে হয়, হয়তো তার কোনো যোগাযোগ আছে এখনও ওই গ্রামের সাথে। কিন্তু সে যা-ই হোক, পুকুরের জলে টুনুদির মালাকে সমাহিত করার ভেতর দিয়ে অপুর জীবনে দিদি-অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। ফুলশয্যার রাতে অপর্ণাকে বলা ছাড়া আর দিদিকে স্মরণ করে না অপু। অথবা করে, 'ভিড়ের মধ্যে একা' মানুষের সেসব একান্ত কথা আমাদের কানে পৌঁছে না, পৌঁছবার কথা নয়।

দুর্গা ও মা (সর্বজয়া)

সর্বজয়া একা হাতে হাল ধরে আছেন এই হতশ্রী সংসারের। এরকমই দেখি আমরা পথের পাঁচালীতে। হরিহর 'লেখাপড়া নিয়ে থাকা' মানুষ; সংসার যে তিনি বোঝেন কম তা আমরা টের পাই বারবার। এই সংসার পরিচালনায় সর্বজয়া সম্পর্কের কতগুলো প্যারাডাইম তৈরি করে নিয়েছেন। ঠাকুরঝির সাথে তাঁর ব্যবহার কঠোর, সেখানে স্পেস না দেওয়ার প্রবণতা প্রবল। অপুর প্রতি তাঁর পক্ষপাত খুবই স্পষ্ট। এই মেহ যে সাধারণ, সর্বজনীন মাতৃমেহ নয় তা আমরা বোধ করি যখন দেখি যে, দুর্গার প্রতি তাঁর আচরণ যথেষ্ট কঠিন। অন্তত্ত সংসারের খর জীবন দুর্গার প্রতি তাঁর ব্যবহার থেকে ঝেড়ে ফেলে সকল আপাত ভালোবাসা। অপুর সাথে মায়ের সম্পর্ক অপরাজিত পর্যায়ে আমাদের আলোচনার প্রধান বিষয়। এই সম্পর্কের বয়ান তাহলে তোলা থাক সেই অধ্যায়ের জন্যে। কিন্তু দুর্গার আলোচনা যা কিছু তা আমাদের শেষ করতে হবে পথের পাঁচালীতেই। কারণ দুর্গার যাত্রা পথের পাঁচালী পেরিয়ের পৌঁছায় না অপরাজিত পর্যন্ত।

সংসারের যে কঠিন অভিজ্ঞতা ক্রমাগত মোকাবেলা করেন সর্বজয়া তা-ই তাঁকে কঠিন করে তোলে কোনো কোনো সম্পর্কের ক্ষেত্রে। দুর্গার প্রতি তাঁর আচরণ যেন সেরকম একটি ব্যাপার। আমরা কিন্তু বোধ করি, নিয়তই যে, এই কঠিন ব্যবহারের নিচে লুকিয়ে আছে একটি কোমল, স্নেহময়



না, এস্কেপ করছে না। সে বাঁচতে চাইছে, সে বলছে বাঁচার মধ্যেই সার্থকতা। তার মধ্যেই আনন্দ। হি ওয়ান্টস টু লিভ।" এভাবে অপু তার উপন্যাসের যে নায়ককে উপস্থাপন করে তার ভেতর তার নিজের জীবনের দর্শনটিই আসলে প্রকাশিত হচ্ছে। নির্জনতার বাসিন্দা অপুর জীবনমুখী ভাবনার ভুবনটিকে এভাবে আমরা চিনতে পারি।

অপু ও পুলু

বন্ধু পূলু সম্ভবত অপুর সাথে বাইরের পৃথিবীর একটি সংযোগ সেতু। অন্তত অপুর মানসিক গঠনটি বোঝার জন্যে অপুর সাথে পুলুর সংলাপ এবং মিথস্ক্রিয়া বিশেষভাবে কার্যকর হয়। আর জানা যায়, পুলুই ছিল কলকাতায় এসে পৌঁছুবার পর অপুর জন্যে নগরের জানালা। সেই সময় যখন 'রাস্তা পার হতে ঘাম ছুটে যেত' তখন পুলুই অপুকে এই শহরকে চিনিয়েছিল। এর ভাষা, যা আবশ্যিকভাবেই নিশ্চিলপুর বা মসনাপোতার ভাষা থেকে আলাদা, তাকে পাঠ করতে শিখিয়েছিল। 'সধবার একাদশী'র মতো নাগরিক ক্লাসিকের সাথে পুলুর হাত ধরেই পরিচিত হয়েছিল অপু।

এসবের বাইরে পুলু নিশ্চয়ই অপুর ভালো বন্ধু। তাই অপুকে তার স্বেচ্ছানির্বাসন থেকে খুঁজে বের করে। এই প্রবল দারিদ্রোর মধ্যে চাকুরির সন্ধান দেয়। থিয়েটার দেখার পর পেট পুরে খেয়ে অপুর মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার হয়! সে প্রথমে সধবার একাদশীর নিমচাঁদের মতো প্রগলভ হয়ে ওঠে। পরে সে তার উপন্যাসের নায়কের প্রোফাইলটি নির্মাণ করতে গিয়ে নিজের জীবন-দর্শনকেই প্রকাশ করে। অপু তখন উচ্ছাসিত, কিঞ্চিত উদ্বেলিত। এসবের একমাত্র দর্শক, শ্রোতা এবং তর্কের ছলে উসকানিদাতা পুলু। পুলুর চ্যালেঞ্জের ভেতর দিয়েই আমরা জানি যে নারী-পুরুষের প্রেম নিয়েও অপুর ভাবনা আছে, সে বিশ্বাস করে অভিজ্ঞতার না থাকলেও কেবল অনুভূতি আর কল্পনাশক্তি দিয়ে একজন মানুষ প্রেমকে বুঝতে পারে। এটা যে, অল্প সময়ের মধ্যেই অপুর নিজের জীবনের সত্য হয়ে উঠবে, তখন কিন্তু তা আমরা জানি না!

পুলু অপুর লেখার এক ভক্ত পাঠক। জানা যায় অপুর প্রথম গল্প সে-ই পাঠ করেছিল। খুলনায় যাবার পথে নৌকায় পুলু গভীর মনোযোগে পড়ে শেষ করে অপুর অসমাপ্ত উপন্যাস। বন্ধুকে আন্তরিক অভিনন্দন জানায়। এভাবে